অভিসরণ / ABHISARON
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue II, July 2026, PP. 153-157
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027(Online)
DOI - https://dx.doi.org/10.67757/abhisaron.2026.v1i2.021

NOIBEDYER TROYEE KOBITA - 64,65 EBONG 66 NO. KABITA : UPONIBESHBADER BIRUDDHHE EKTI AGNEYA PROTIBAD / 'নৈবেদ্য'র ত্রয়ী কবিতা—৬৪,৬৫ এবং ৬৬ নং কবিতা: উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে একটি আগ্নেয় প্রতিবাদ

RANJAN MANNA / রঞ্জন মান্না
শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, মহারানী কাশীশ্বরী কলেজ
Email: ranjanmanna21@gmail.com

Accepted: 07.07.2026
Published: 20.07.2026

Keywords:
নৈবেদ্য, রবীন্দ্রনাথ, উপনিবেশিক শাসন, জাতীয়তাবাদ, স্বদেশ প্রীতি, বর্বরতা, নারকীয় কর্মকাণ্ড

Abstract:
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখনীতে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার প্রখর সুর ধ্বনিত হয়েছে।তিনি ছিলেন উপনিবেশবাদের একজন তীব্র সমালোচক। তাঁর সাহিত্য ও দর্শনে সাম্রাজ্যবাদের,রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে। তিনি ঔপনিবেশিক শিক্ষার অন্ধ অনুকরণ ও সঙ্কীর্ণ উগ্র জাতীয়তাবাদের তীব্র বিরোধিতা করে মানবিকতা ও বিশ্বজনীনতার জয়গান গেয়েছেন। 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে উগ্র জাতীয়তাবাদ সমাজে বিভেদ ও হিংসার জন্ম দেয়। তাঁর মতে, মুক্তির আসল পথ হলো আত্মশক্তি গঠন ও মানবতার বিকাশ। 'সভ্যতার সংকট' (১৯৪১) প্রবন্ধে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের নির্মমতা ও নৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।'নৈবেদ্য' কাব্যে ফুটে উঠেছে ভারতীয় জীবনাদর্শের ও ধর্মাদর্শের পূর্ণতম অভিব্যক্তি।এই কাব্যের মূল সুর হল আত্মশক্তি অর্জন ও নিজস্ব সংস্কৃতির শিকড়ে ফিরে আসা,যা ঔপনিবেশিক অধীনতা ছিন্ন করার সচেষ্ট প্রয়াস।যে মানববিশ্ব ভাবনায় কবি উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন,যে সময় পর্বে অন্তর্যামী এবং মনুষ্যধর্মের স্তব গানের প্রতি তাঁর মন নিমগ্ন ছিল সেই সময়ের ফসল 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থ।উপনিবেশিক বস্তুতন্ত্র ও শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক আধ্যাত্মিক প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে তাঁর বহু কবিতায়।

Discussion:

উপনিবেশিক শাসন শুধু রাজনৈতিক নয়, ছিল সংস্কৃতিক আগ্রাসন। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতায় ঈশ্বর ভক্তি ও নৈতিক শক্তির উপরে জোর দেওয়া হয়েছে, যা ছিল উপনিবেশিক বস্তুতন্ত্র ও শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক আধ্যাত্মিক প্রতিবাদ। উপনিবেশিকতার অন্তঃসারশূন্যতা ও লোভকে কবি ভদ্রবেশী বর্বরতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি মনে করেন বাহ্যিক উজ্জ্বলতার আলোকবর্তিকায় মুগ্ধ না হয়ে স্বদেশের আত্মাকে উপলব্ধি করা জরুরি। 'নৈবেদ্য' কাব্যের মূল সুর হল আত্মশক্তি অর্জন ও নিজস্ব সংস্কৃতির শিকড়ে ফিরে যাওয়া। যা ঔপনিবেশিক অধীনতার শেকল ভাঙ্গার অন্যতম গান। ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের বিপরীতে তিনি এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যা মানবতার দ্বারা পরিচালিত হবে। তৎকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর অন্ধ অনুকরণ ও আত্মবিস্মৃতির বিরুদ্ধে কবি ভারতীয় সভ্যতার শাশ্বত আদর্শ, জাতীয়তাবাদ ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের জাগরণ ঘটিয়ে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ডাক দিয়েছিলেন। ভারতের উপনিবেশবাদী শাসন, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গড়ে উঠেছিল বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা। রবীন্দ্রনাথের শিশুকালে ১৮৬৭ সালে নবগোপাল মিত্র (১৮৪০-১৮৯৮), রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) হিন্দু মেলার প্রচলন করেন। পরে প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল সোসাইটি, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, সঞ্জীবনী সভা। গুপ্ত সমিতি 'সঞ্জীবনী সভা'-র সদস্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তার সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহ শিক্ষক ও বিশিষ্ট সমাজসেবক রাজনারায়ণ বসু এবং সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন—

"জ্যোতিদাদা এক পোড়া বাড়িতে এক গুপ্তসভা স্থাপন করেছেন। একটা পুরো বাড়িতে তার অধিবেশন, ঋগ্বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত। সেখানে আমরা ভারত উদ্ধারের দীক্ষা পেলাম।" [১]

রবীন্দ্র কাব্যে উপনিবেশবাদ এক বহুমাত্রিক ও জটিল প্রত্যয়। তার সাহিত্য ও দর্শনে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা এবং স্বজাত্যবোধের প্রকাশ থাকলেও, উপনিবেশিক শাসনের শোষণ ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তার সৃষ্টিতে উপনিবেশবাদ মূলত দুটি প্রধান ধারায় বিশ্লেষিত হয়—বাহ্যিক সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা এবং সাংস্কৃতিক পরাধীনতার বিরুদ্ধে আত্মজাগরণ। উপনিবেশিক শক্তির শোষণ, লুণ্ঠন এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ তাঁর বিভিন্ন কবিতায় ('ভারতবর্ষ', 'নৈবেদ্য' কাব্যের কবিতা) প্রকাশিত হয়েছে। তিনি সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী রূপকে মানুষের 'সভ্যতার সংকট' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ এবং উপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন তিনি। তাঁর রচনায় স্বদেশি সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ও আত্মনির্ভরশীলতার দাগ এসেছে বারবার। উপনিবেশবাদের মোহে অন্ধ উগ্র জাতীয়তাবাদের চেয়ে তিনি মানবতাবাদ ও বিশ্বজনিতাকে বড় করে দেখেছেন। 'গোরা' উপন্যাসের বা তাঁর বিভিন্ন কাব্যে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে উঠে উদার মানবতার জয়গান গাওয়া হয়েছে। উপনিবেশবাদের আগ্রাসন রুখতে রবীন্দ্রনাথ ভারতের প্রাচীন বৈদিক ও উপনিষদের ঐতিহ্য, তপবনের আদর্শ এবং আধ্যাত্মিক চেতনাকে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে প্রাচ্যের এই দর্শনের কাছেই পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী আগ্রাসনের সঠিক জবাব রয়েছে। স্বদেশ প্রীতি ও ঈশ্বরই ভক্তি 'নৈবেদ্য'র প্রধান বিষয়বস্তু হলেও দেশাতিত মানবের মঙ্গলের জন্য কবির অন্তর সর্বদাই উদগ্রীব। কবির অন্তরাত্মা খণ্ডিতভাবে জগতকে দেখতে পারেনা। স্বদেশের দুঃখে কবি অন্তরে যে

বেদনা জাগে বিদেশের অপমানেও তাঁর চিত্ত আঘাতপ্রাপ্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই শ্রেণির কবি যিনি দেশের ও জগতের সকল আন্দোলন-আলোচনার সংবাদ রাখতেন এবং অন্যায় অবিচারের জন্য তীব্র বেদনা বোধ করতেন।

'নৈবেদ্য'-র ত্রয়ী কবিতার—৬৪, ৬৫ এবং ৬৬ নং কবিতায় ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে তা শুধু বিরল নয় অভূতপূর্ব।" 'নৈবেদ্য' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯০১ সালে। ১৩০৭ সালের ফাল্গুন মাসের মধ্যেই নৈবেদ্যর শত কবিতা লেখা হয়ে গিয়েছিল"। [২] ভারতীয় জীবনাদর্শের ও ধর্মাদর্শের পূর্ণতম অভিব্যক্তি 'নৈবেদ্য' কাব্যে ফুটে উঠেছে। উপনিবেশবাদের ক্রূর বর্বরতা, নারকীয় কর্মকাণ্ড, নিম্নগামীতা কবিকে ব্যথিত করে তোলে। এই অভিঘাতের ফসল 'নৈবেদ্য' কাব্যের ৬৪, ৬৫ এবং ৬৬ সংখ্যক কবিতা। এই কবিতা ত্রয়ীতে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে যে তীক্ষ্ণ ধিক্কার, বর্জ্রকণ্ঠ ঘোষিত হয়েছে তা কবির মানব-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার অভিজ্ঞান। যে ভারত সন্ধান, আত্মঅন্বেষা, মানব বিশ্ব ভাবনা এই সময় পর্বে কবির ব্যক্তিত্বকে গাম্ভীর্যতা দান করেছিল, যে সময় পর্বে কবিচিত্ত উন্মুখ হয়ে উঠেছিল একধারে অন্তর্যামী এবং মনুষ্যধর্মের স্তবগানের প্রতি, এই পর্বে তার সঙ্গে এই আগ্নেয় কঠিন প্রতিবাদের একটি নিগূঢ় মিল আছে।
'নৈবেদ্য'-র ৬৪ সংখ্যক কবিতা—

"শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিনী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতানাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমেষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম—প্রলয়মন্থনক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি, প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিদল চিৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।"[৩]

উনিশ শতকের শেষ দিকে ইউরোপের নব-উন্মেষিত জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান ঘটে। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের কপটচারিতা, বর্বরতা ও মদান্ধতার বিমূঢ় আস্ফালন লক্ষ্য করা যায়। এই প্রেক্ষাপটে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের কপটচারিতা ও বর্বরতার মুখোশ উন্মোচন অত্যন্ত জরুরী সমস্যা ছিল। তৎকালীন রবীন্দ্রমানস ও ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিল। পাশ্চাত্যের অত্যুগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করার কোনো সুযোগ তিনি হাতছাড়া করেন নি। সুসভ্য ইউরোপ শুধু যে তার সীমানার বাইরে আদিম বর্বরতার স্বাক্ষর রেখেছে, তাই নয়, স্বদেশ ও স্বার্থচেতনা, জাতিবিদ্বেষ, জাতিবৈরীতা পুরোপুরি মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ইংরেজের উপনিবেশবাদী, সাম্রাজ্যবাদী, জাতিবিদ্বেষ জনিত অত্যাচারের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন।

বিশ্বজুড়ে হিংসার উৎসবে অস্ত্রের সংঘাতে মরণের ভয়ঙ্কর সুর জেগে উঠেছে। তথাকথিত সভ্যতার গৌরব প্রচারকারী পাশ্চাত্য দেশগুলির দয়াহীনতা কুটিল ফনা বিস্তার করেছে। স্বার্থের সংঘাত বেঁধেছে দেশগুলির মধ্যে। লোভ লালসার তীব্রতায় দেশগুলির মধ্যে সংগ্রাম উপস্থিত। কবিতাটি বুয়র যুদ্ধ এবং চীনের বক্সার বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে লেখা। উভয় ক্ষেত্রেই উপনিবেশবাদীদের উৎপীড়ন মানুষের সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল। কদর্য ক্ষমতালিপ্সা, বর্বরতা, পরপীড়নের উৎকট অভিসন্ধি পশ্চিমী সভ্যতার আগ্রাসনী প্রকৃতিকে স্পষ্ট করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই অসভ্যতাকে বারে বারে ধিক্কার জানিয়েছিলেন। শান্তিকামী বুয়রদের উপর যে অন্যায় অবিচার দমনপীড়ন চালিয়ে ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা তার প্রতিবাদে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ। অন্যদিকে প্রায় সমসময়ে চীনে বক্সার বিদ্রোহ ঘটে। জার্মানি জোর করে চীনের কীয়াচো শহরটি ছিনিয়ে নেয়। বাণিজ্যিক স্বার্থেই ছিল এই আগ্রাসন। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয় চীনের সাধারণ মানুষ, ধ্বংস হয়ে যায় সুপ্রাচীন চৈনিক সভ্যতার বহু উত্তরাধিকার। শতাব্দী শেষের এই দুই যুদ্ধ মানুষের পৃথিবীকে যে রুধিরাক্ত করে তুলেছিল তারই প্রতিফলন ধরা পড়েছে অস্তদিগন্তের 'রক্ত মেঘ মাঝে'। এখানে প্রতিফলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তীব্র যুগচেতনা। তিনি সুসভ্যতার মুখোশ পরা ইউরোপের পাশবলীলাকে ধিক্কার জানিয়েছিলেন তার স্বভাবসিদ্ধ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই।

অন্তর্দশী কবি এই কঠিন অন্ধকারময় নিরাশ্বাসে ভবিষ্যতের ছবিটিও সঞ্চারিত করেছেন, যার অনুসৃতি আছে ৬৬ নং কবিতার সূচনা অংশে—

"এই পশ্চিমের কোণে রক্তরাগরেখা
নহে কভু সৌম্যরশ্মি অরুণের লেখা
তব নব প্রভাতের। এ শুধু দারুণ
সন্ধ্যার প্রলয়দীপ্তি। চিতার আগুন
পশ্চিমসমুদ্রতটে করিছে উদ্‌গার
বিস্ফুলিঙ্গ, স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার
মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা।"[৪]

জাতির নামে উপনিবেশবাদীরা জঘন্যতম অন্যায়, অত্যাচার চালায় পৃথিবীর সর্বত্র। এই জাতীয়তাবাদের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকে বর্বর রাষ্ট্র স্বার্থ। জাতীয়তাবাদের মুখোশ খুলতেই কবি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—

"লজ্জা শরম তেয়াগি
"জাতি প্রেম নাম ধরি, প্রচন্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চায় বলের বন্যায়"।[৫]

স্বার্থান্ধ এই প্রচণ্ড অন্যায়ের পরিণাম কি মারাত্মক হতে পারে তার ইঙ্গিত আছে 'নৈবেদ্য'-র ৬৫ নং কবিতায়—

"ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।"[৬]

ঊনবিংশ শতকের মেঘাচ্ছন্ন দুর্যোগ পূর্ণ অবস্থায়, বিশ্বজুড়ে এক হিংসার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল। পাশ্চাত্য দেশগুলি নিজেদের স্বার্থে লোভে সংগ্রামে লিপ্ত হয়, তাদের স্বার্থেলোভের আকাঙ্ক্ষা শেষ হয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। হঠাৎ এক অশুভপূর্ণ আঁধারে পরিপূর্ণ বৃদ্ধির মাঝে এক ভয়ংকর কালের আঘাত সবকিছু চুণবিচূর্ণ করে দেয়। দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা পৃথিবীর এই শাস্ত্রীয় রীতি নীতি একজনের প্রভুত্বকে কখনই স্থায়িত্ব দেয়নি। কালের

নিয়মে তাদের বিনাশ হতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির লোভের ক্ষুধা আপন স্বার্থ পূরণের সীমাকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলে। জগৎ পৃথিবীর কোন কিছুই বাদ পড়ে না তাদের কাছে। আর যখন এই অত্যন্ত ঘৃণ্য ক্ষুধার লোভ নিষ্ঠুর নির্লজ্জ হয়েও গর্জে ওঠে তখন ভয়ঙ্কর বজ্রের আঘাত জাতি প্রেম মৃত্যুর সন্ধানে স্বার্থের নৌকায় চেপে ছুটে চলে গুপ্ত পর্বতের দিকে। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের উদ্ধত ব্যবহারের পরিণাম সম্বন্ধে কবি বলেছেন একদিন— 'স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে'[৭] হবে। সভ্যতার নামে, জাতির নামে ভদ্রবেশী বর্বররা যে অন্যায়, যে পীড়ন চালাতো তাদের সেই কুকর্মের সহযোগী ছিল যে কবি দল তিনি তাদের কবিকর্মকে 'শ্মশান কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি গীতি' বলেছেন নিঃসঙ্কচে। মানুষ, মানুষের ধর্ম পৃথিবীর যখন যেখানে নির্যাতিত হয়েছে সেখানেই কবিকণ্ঠ গর্জে উঠেছে। মানবানুরাগই যাঁর সমস্ত সৃষ্টির গোমুখী, 'মানুষের ধর্ম'-ই যাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপনিবেশবাদের প্রবল প্রতিপক্ষ হবেন এটাই একান্ত স্বাভাবিক।

Reference:

1. আত্মপরিচয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ-৮
2. রবীন্দ্র জীবনকথা, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়
3. রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড-৯৯১
4. রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড-১১২
5. রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড-৯৯১৬
6. বাংলা সাহিত্যে ইতিবৃত্ত, দশম খণ্ড

Bibliography:

1. গিরি, সত্যবতি, (সংকলন) ঔপনিবেশিক ও উত্তর ঔপনিবেশিক বাংলা সাহিত্য, ১৫ ডিসেম্বর ২০০১, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
2. চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সুহাঁস, (সম্পাদিত) মার্কসবাদ ও নন্দনতত্ত্ব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।
3. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ধর্ম, আষাঢ় ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, বিশ্বভারতী।
4. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সঞ্চয়িতা, চতুর্থ সংস্করণ, তুলি-কলম, কলকাতা-৯।
5. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দশম খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩।
6. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী, পঞ্চম সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ।
7. মজুমদার, মোহিতলাল, রবীন্দ্রনাথ, প্রকাশ ভবন, কলকাতা-৭৩।

CC BY NC